গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ৬ - ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

অর্থনীতি বেহাল
সরকার ব্যস্ত দায় এড়াতে

প্রবাদ আছে, ঝড় এলে উটপাখি তার বিরাট দেহটা লুকোতে না পেরে শুধু মুখটুকু বালিতে গুঁজে দিয়েই ভাবে সে রক্ষা পেল! দেশের মন্দা কবলিত অর্থনীতি নিয়ে বিজেপির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কথাটি মনে পড়ছে। ১৩০ কোটি মানুষের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার যদি শুধু নিজেদের চোখটুকু বুজে রেখেই ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তা হলে তাকে কী বলবেন? তাকে কি কোনও দায়িত্বশীল সরকার বলবেন? এটা কি দেশের মানুষের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়?

দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মোদি রাজত্বে অর্থনীতির হাল ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। আর্থিক বৃদ্ধির হার চলতি অর্থবর্ষে প্রথম ত্রৈমাসিকে ৫ শতাংশ থেকে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে নেমে এসেছে ৪.৫ শতাংশে। মন্দা গ্রাস করেছে গোটা অর্থনীতিকে। চরম দুর্ভোগে পড়েছে দেশের মানুষ। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। মানুষের হাতে কাজে নেই। বেকার সমস্যা গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে। ক্রমাগত কমছে আয়। খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসার মতো অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলিতেও ব্যয় কমাতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। মুনাফা অটুট রাখতে, কখনও এমনকি তা আরও বাড়িয়ে নিতে ইচ্ছামতো দাম বাড়াচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে ঠেকায় শিল্পপণ্য থেকে খাদ্য সব কিছুর বিক্রি কমছে। ফলে উৎপাদন কমছে। এমনকি মোটরগাড়ির মতো শিল্প, যার ক্রেতা উচ্চ মধ্যবিত্তরা, সেখানেও মন্দা মারাত্মক ছোবল বসিয়েছে। শিল্পমালিকরা একের পর এক শিফট বন্ধ করে দিচ্ছে, ছেঁটে ফেলছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাজারে পণ্য বিক্রি না হওয়াই এই মন্দার মূল কারণ। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কেন মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই? কেন তা কমে গেল? এর জন্য দায়ী কে? দায়ী কি সাধারণ মানুষ? বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিজেপি সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী নীতিই এর জন্য পুরোপুরি দায়ী। না হলে তো সরকার জনগণের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চেষ্টা চালাতো, তা চালাচ্ছে কি? বাস্তবে যে পদক্ষেপগুলি সরকার নিচ্ছে তার কোনওটির সাথেই দেশের সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রথমত, অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ক্রমাগত নেমে যাওয়া, প্রধান পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন ব্যাপক হারে কমে যাওয়া, গত ৪৫ বছরে কর্মসংস্থানের হার একেবারে তলানিতে চলে যাওয়া, খাদ্য-শিক্ষা-চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের ব্যয় অভূতপূর্ব হারে কমে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার ও তার মন্ত্রীরা মন্দার

দুয়ের পাতায় দেখুন

সরকারি ব্যর্থতায় রাজ্যে
ভয়াবহ আকার নিয়েছে ডেঙ্গু

গত ক'বছর ধরে বর্ষার শুরুতে এবং শেষে প্রায় তিন মাস গোটা রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছেন ডেঙ্গু জ্বরে। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ আকার নিয়েছে যে বেশিরভাগ হাসপাতালের ৭৫-৮০ শতাংশ শয্যাই এই সময়ে ডেঙ্গু রোগীদের দখলে। হাসপাতালগুলিতে চূড়ান্ত অপ্রতুল চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মী। তবুও যাঁরা এর মধ্যেও কিছুটা পরিষেবা দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা জায়গা দিতে না পেরে দিশেহারা। অবস্থা এমন হওয়ার কারণ, গত ক'বছর ধরে ডেঙ্গু রোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। আর

২৬ নভেম্বর। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধকালীন তৎপরতার দাবিতে কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিক্ষোভ

এ তো জানা কথাই যে, গোড়ায় সমাধান না করে যদি সমস্যা চাপা দেওয়া হয় তাহলে তা বেড়েই চলে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

সরকারি উদ্যোগে ডেঙ্গু চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চলতে থাকায় জনস্বাস্থ্যে (পাবলিক হেলথ) যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাব আটকানোর পথে রাজ্য পৌরসভা, পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্যদপ্তরগুলি হাঁটল না। স্বাস্থ্যদপ্তর রোগ অস্বীকার করায়, ধামাচাপা দেওয়ায়, চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন-ট্রিটমেন্ট ফাইলে রোগের প্রকৃত কারণ না লিখতে বাধ্য করা—

দুয়ের পাতায় দেখুন

দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান ডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে

২৬-২৯ নভেম্বর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন চাষি আত্মঘাতী হায়রে আচ্ছে দিন !

এ দেশে প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন চাষি ঋণের দায়ে বা ফসলের ন্যূনতম দাম না পেয়ে আত্মঘাতী হন। এ বছর ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো' ২০১৬ সালের কৃষক আত্মহত্যার রিপোর্টটি প্রকাশ করে। কেন এই বিলম্ব? ক্রমাগত বাড়তে থাকা কৃষক আত্মহত্যার এই পরিসংখ্যানের সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া লোকসভা নির্বাচনে ছাপ ফেলতে পারে, সেই আশাঙ্কাতেই রিপোর্টটি দু-বছর পর প্রকাশ হল। এই দু'বছরে তারা আত্মহত্যার তথ্য পরিবেশনের সারণীতে একটা পরিবর্তন ঘটাল। দেখা গেল 'অন্যান্য' শিরোনামে আত্মহত্যার সংখ্যা বিগত বছরগুলির তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আবার ভাগ চাষিদের যেহেতু নিজের জমি নেই, তাই তাদের কৃষক তালিকাতে না রেখে কৃষি মজুরের তালিকাভুক্ত করা হল। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষক আত্মহত্যাকে কম করে দেখানো গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অর্থনীতির বেহাল দশার মাশুলটা যে দিতে হচ্ছে কৃষকদের, এই ভয়াবহ সত্যটা ঢাকতে সরকার মরিয়া।

তা সত্ত্বেও যে সত্যটা বেরিয়ে এল রিপোর্টে, ভয়াবহতায় তা কম কোথায়? ২০১৬ সালে মোট ১১, ৩৭৯ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে ৯৪৮ জন, দৈনিক হিসাবে ৩১ জন। আর ১৯৯৫ সালে যখন থেকে এন সি আর বি-এর এই রিপোর্ট প্রকাশ শুরু হয়েছিল, সেই সময় থেকে দু-দশকে কৃষক আত্মহত্যা ঘটেছে ৩ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি। রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র কৃষক আত্মহত্যায় শীর্ষে। এরপরেই রয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়। এগুলির বেশিরভাগই তখন বিজেপি শাসিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য কেন্দ্রকে দেয়নি। অথচ সেখানেও যে কৃষক আত্মঘাতী হয়েছে সে সংবাদ নানা সময়ে খবরে উঠে এসেছে। এমনই একটি খবরে প্রকাশ গত সাত বছরে এ রাজ্যে ২০০টি কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

কেন এই আত্মহত্যা? নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের উদার আর্থিক নীতিতে গ্রামাঞ্চলও বিশ্বের খোলাবাজারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে চাষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী—সার-বীজ-কীটনাশক নিয়ে মুনাফা লুটতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা। চাষের সামগ্রী নিয়ে অসাধু ব্যবসা ও কালোবাজারি চলছে। সরকারও বিশ্বায়নের নীতি মেনে ভর্তুকি তুলে নিল। এর ফলে বাড়ছে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম। ফলে চাষের খরচ বেড়ে যাচ্ছে বিপুল হারে। এই বিপুল খরচ বহন করতে চাষিকে ঋণ করতে হচ্ছে। সরকারি ঋণ পেতে কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে বারবার সরকারি দপ্তরে ছোটার হয়রানি এড়াতে চাষি যাচ্ছে মহাজনের কাছে। সেখানে চড়া সুদে হলেও নগদ টাকা হাতে পেয়ে সময় মতো চাষটা শুরু করতে পারে চাষি। এরপর প্রকৃতি সদয় হলে চাষ করে ফসল ঘরে তোলে। শুরু হয় মহাজনের তাগাদা। নইলে চড় চড় করে বাড়বে সুদ। চাষি ছোটে সরকারি দপ্তরে ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রি করতে। কিন্তু দপ্তর তখন ঘুমিয়ে। কারণ ফসল কেনার সরকারি নির্দেশ আসেনি। নিরুপায় চাষিকে ছুটতে হয় কাছেই ওত পেতে বসে থাকা ফড়েদের কাছে। তারাই বিশ্ববাজারের এজেন্ট। তারা চাষিকে বোঝায় বাজারের মন্দার কথা। ফলে চাষি জলের দরে ফড়েদের হাতেই তার পরিশ্রমলব্ধ ফসল তুলে দিতে বাধ্য হয়। কিংবা রাগে দুঃখে ফসলে আগুন লাগিয়ে নিজে আত্মঘাতী হয়। এর সাথে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কোথাও খরায় চাষি সেচের জন্য ন্যূনতম জলটুকুও পায় না, কোথাও বন্যায় নষ্ট হয় ফসল। এভাবেই দেশের মানুষের মুখে যারা অন্ন যোগায়, তারা বছরের পর বছর ধরে আত্মঘাতী হয়ে চলেছে।

এ দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। এদের ৮৬.২ শতাংশ হল প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষি। এদের মোট জমির পরিমাণ মোট চাষযোগ্য জমির ৪৭.৩ শতাংশ। এর সাথে যাঁরা ২ থেকে ১০ হেক্টর জমির মালিক অর্থাৎ নিম্ন-মধ্য ও মধ্য চাষিরা হল ১৩.২ শতাংশ। অথচ এদের হাতে কৃষি জমি রয়েছে ৯.১ শতাংশ (দশম এগ্রিকালচারাল সেনসাস রিপোর্ট, ২০১৫-'১৬)। অর্থাৎ মুষ্টিমেয়র হাতে বেশি লাভজনক জমি। আবার সেনসাস সমীক্ষায় ধরা পড়েছে পাঁচ বছরে প্রান্তিক চাষির সংখ্যা বেড়েছে ৯০ লক্ষ। প্রসঙ্গত রাশিয়ার বিপ্লবের আগেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন, মুষ্টিমেয়র হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া, খেতমজদুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং ফসল জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়া— এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সুনির্দিষ্টভাবে তা দেখিয়ে দেয়। এ দেশের কৃষকরাও এই পুঁজিবাদী শোষণেরই শিকার। বিশ্বায়নের ফলে কৃষকের ফসল আজ শুধু জাতীয় বাজার নয়, আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ', কিন্তু গ্রামের অলাভজনক জোতের চাষিদের বিকাশ, আর সার-বীজ-কীটনাশকের কালোবাজারি এবং বিশ্ববাজারের এজেন্ট ফড়েদের বিকাশ তো একই পথে হতে পারে না। সরকার কীভাবে উভয়ের স্বার্থ একসাথে রক্ষা করবে? আসলে সরকার তার করপোরেটের স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্রকে আড়াল করতেই এই স্লোগান তুলছে। তাই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মন্দা থেকে বাঁচাতে সরকার ১ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা ইনসেনটিভ দিতে পারে, আবাসন শিল্পের ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে ২৭ হাজার কোটি টাকা অনুদান দিতে পারে, কিন্তু ঋণগ্রস্ত কৃষকদের ঋণমকুবের ব্যবস্থা করতে পারে না। দেশের সত্তর ভাগ মানুষকে অর্ধমৃত করে রেখে দেশের প্রকৃত 'বিকাশ' বা যথার্থ 'উন্নয়ন' হতে পারে কি? তা যে পারে না, তার অন্যতম কারণ হল বর্তমান মারাত্মক মন্দা, যার অন্যতম কারণ চাহিদার অভাব। দেশের বেশিরভাগ কৃষকের দুরবস্থা এর এর অন্যতম কারণ। বর্তমান মন্দা পরিস্থিতির কারণ হিসাবে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না-থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। কোটি কোটি গ্রামীণ মানুষকে নিঃস্ব-রিক্ত করে রেখে সেই বাজার তৈরি হবে কি? আজ রাজ্যে রাজ্যে কৃষকরা বাঁচার দাবিতে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। হাজারে হাজারে সামিল হচ্ছেন প্রতিবাদে, মিছিলে। প্রয়োজন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাঁদের সমস্যাকে সঠিকভাবে বুঝতে শেখাবে এবং আন্দোলনকে চালিত করবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

সরকার ব্যস্ত দায় এড়াতে

একের পাতার পর

কথা অস্বীকার করে চলেছেন। সরকারি সমীক্ষাতেই মন্দার ভয়াবহ চিত্র উঠে আসছে। অথচ তাকে ক্রমাগত গোপন করা হচ্ছে। সরকারের মন্ত্রী-আমলারা বাস্তবটা না দেখার ভান করে বলে চলেছেন, 'সব ঠিক হ্যায়'। দ্বিতীয়ত, মন্দা মোকাবিলার নামে তাঁরা যা করছেন তা হল, শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের— যাদের সমর্থন ও টাকার জোরে তারা ক্ষমতায় বসেছে, তাদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়ে দিতে সরকারি কোষাগার ফাঁকা করে 'কর ছাড়' 'ত্রাণ প্রকল্প' প্রভৃতি নানা নামে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ করে চলেছে। পুঁজিপতিদের আবদার মেনে নিয়ে কর্পোরেট করে সরকার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা ছাড় ঘোষণা করেছে। গাড়ি শিল্পকে ১ লক্ষ কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ দিয়েছে। আবাসন প্রকল্পগুলির আবদার মেনে ২৫ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গড়ে দিয়েছে। টেলিশিল্পগুলির আবদার মেনে তাদের কাছে সরকারের ন্যায্য পাওনা ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলেছিল, সরকার তা দু'বছরের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে ফাঁকা কোষাগারকে ভরে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। একের পর এক বেচে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প এবং সম্পত্তিগুলি।

অথচ মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের বাজারের যারা প্রধান ক্রেতা সেই কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের হাতে টাকার জোগান নিশ্চিত করে, সার-বীজ-কীটনাশকের দাম কমিয়ে তাদের কেনার ক্ষমতা বাড়ানো। প্রয়োজন ছিল, দেশের সবচেয়ে বেশি মানুষ যে কৃষির সঙ্গে যুক্ত সেখানে কালোবাজারি মজুতদারি, আড়তদারি, কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের সব চেয়ে বড় যে অসংগঠিত অংশ তাদের ন্যায্য মজুরি পাওয়ার গ্যারান্টির ব্যবস্থা করা। অথচ সরকার এ সব কোনও কিছুই করছে না। কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। কালোবাজারি, মজুতদাররা জলের দামে কৃষিদ্রব্য কিনে নিয়ে লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা করছে। আলু, পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। সরকার একের পর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন নিয়ে আসছে। কাজের স্থায়িত্ব, মজুরি কোনও কিছুর গ্যারান্টি থাকছে না। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিক-কৃষকের কেনার ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে। এই অবস্থায় মালিকদের সিন্দুকে যতই টাকা ভরে দিক তাতে উৎপাদন বাড়তে পারে না। কারণ বাজারে ক্রেতা না থাকলে কোনও মালিক উৎপাদন করবে না, তা তার হাতে যত পুঁজিই থাকুক। অর্থাৎ সরকারের জনবিরোধী নীতিই বর্তমান ভয়াবহ মন্দার জন্য দায়ী। অথচ এর দায় বহন করতে হচ্ছে দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষকে। তাদেরই আজ অর্ধাহারে, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় দিন কাটাতে হচ্ছে।

সরকারের এই জনবিরোধী নীতির কুফল যা দেশের মানুষের উপর বর্তেছে তা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘোরাতে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা প্রথমে ৩৭০ ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তুলে দেশ তোলপাড় করলেন। তার ঢেউ কমতেই রামমন্দির নির্মাণকে মানুষের জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত করে দিলেন। যখন দেখলেন তাতেও কাজ হচ্ছে না, তখন দেশজুড়ে এনআরসি করার কথা ঘোষণা করে চলেছেন। দেশে অনুপ্রবেশকারী খুঁজতে গোটা জাতিকে নাগরিকত্ব প্রমাণের পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার না দেখতে চাইলেও এটাই যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণাম দেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন এবং এটা নিশ্চিত যে তারা তা চুপচাপ মেনে নেবেন না।

ভয়াবহ আকার নিয়েছে ডেঙ্গু

একের পাতার পর

এসব চলল লাগাতার। মেডিকেল এথিক্স মেনে এই রোগ চেপে যেতে যে চিকিৎসকরা অস্বীকার করছেন, তাঁদের নানাভাবে হেনস্থা, শোকজ— এমনকি সাসপেন্ড করার দিকে দপ্তর এগিয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই যুগে গবেষণার দ্বারা প্রকোপ বাড়ার আগেই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়। তা না করে রোগ চাপা দেওয়ায় কেবল কোনও একটি বছরে চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়েছে তা নয়, রোগের ভয়াবহতা কম দেখানোর কারণে প্রাথমিক যে সব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল, অর্থ, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম বরাদ্দ করা, হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নতি করা ইত্যাদি কাজে থেকে যাচ্ছে চূড়ান্ত ঘাটতি। ফলে বছর বছর বেড়ে চলেছে ডেঙ্গুর প্রকোপ।

এর পাশাপাশি সর্বত্র মশা নিধন কর্মসূচি অবহেলিত হয়েছে। দক্ষ এবং অদক্ষ সব ধরনের কর্মীর অভাব থাকায় এ কাজ যথাযথ ভাবে হচ্ছে না। বাস্তবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কর্মীদের কাজে লাগিয়ে এই রোগ নিয়ে কিছু ব্যানার-মাইক প্রচার ছাড়া বিশেষ কিছু হয়নি। যে কাজগুলি জরুরি তা হল — ১) জঞ্জাল অপসারণ, ২) বাড়ি এবং এলাকায়, বিশেষত পরিত্যক্ত জমি-কারখানা এবং আস্তাকুঁড়ে জমা জলে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা, ৩) সর্বত্র নির্দিষ্ট সময় মতো উপযুক্ত পরিমাণে উন্নত মানের মশা মারার তেল প্রয়োগ, ৪) খাল ও নিকাশি সংস্কার, ৫) পৌরসভা এবং সরকারি হাসপাতালে বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগে উপযুক্ত সংখ্যক সাধারণ এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য কর্মী দ্বারা দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ৬) সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত প্লেটলেটের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি অবিলম্বে কার্যকর করা সহ ডেঙ্গুতে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের হাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃত্বে গত ২৬ নভেম্বর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও মেয়রের উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্কসকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি।

প্রশ্ন ঃ কমিউনিজম কী?

উত্তর ঃ কমিউনিজম হল সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির জন্য আবশ্যক শর্তাবলি সংক্রান্ত মতবাদ।

প্রশ্ন ঃ সর্বহারা শ্রেণি কী?

উত্তর ঃ সর্বহারা শ্রেণি হল সমাজের সেই শ্রেণি যারা জীবনধারণের রসদ জোগাড় করে সম্পূর্ণভাবে ও কেবলমাত্র শ্রম বিক্রি করে, কোনও রকম পুঁজি থেকে পাওয়া লাভ দিয়ে নয়। যাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, সমগ্র অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাল আর মন্দ পালা-বদলের উপর, লাগামছাড়া প্রতিযোগিতার ওঠা-পড়ার উপর। এক কথায় প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণি হল উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণি।

প্রশ্ন ঃ তা হলে কি সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না?

উত্তর ঃ না। গরিব মানুষ আর মেহনতি শ্রেণি সবসময়েই থেকেছে। মেহনতি শ্রেণিগুলির বেশির ভাগই ছিল গরিব। কিন্তু আজকের দিনে যে পরিস্থিতিতে গরিব মেহনতি মানুষের বাস, তা আগে ছিল না। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না। ঠিক যেমন এই ধরনের বল্গাহীন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগও চিরকাল ছিল না।

প্র ঃ সর্বহারা শ্রেণির উদ্ভব হল কী ভাবে?

উত্তর ঃ শিল্প বিপ্লবের ফল হিসাবেই সর্বহারা শ্রেণির জন্ম হয়েছিল, যে বিপ্লব গত শতাব্দীর (অষ্টাদশ) দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্টিম ইঞ্জিন, সুতো কাটার নানাবিধ যন্ত্র, যন্ত্র চালিত তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিপুল সম্ভার আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শিল্পবিপ্লব দ্রুতগতিতে বাস্তব রূপ নিতে থাকল। এই সমস্ত যন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় একমাত্র বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষেই তা কেনা সম্ভব ছিল। এই নতুন যন্ত্র এবং প্রযুক্তি উৎপাদনের পুরো পদ্ধতিটাকেই পাল্টে দিল। সাথে সাথে আগেকার কারিগর এবং হস্তশিল্পীদেরও উচ্ছেদ করে দিল। কারণ, হস্তশিল্পীরা তাদের পুরনো চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে যা উৎপাদন করত তার তুলনায় মেশিন এখন অনেক সস্তায় অনেক উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। এই সব যন্ত্রপাতিই শিল্পোদ্যোগকে পুরোপুরি তুলে দিল বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে এবং হস্তশিল্পীদের হাতে থাকা অকিঞ্চিতকর সম্পত্তিকে (যেমন— ছোটখাটো যন্ত্রাদি, তাঁত ইত্যাদি) নেহাত অকেজো জিনিসে পর্যবসিত করল। এইভাবে অচিরেই পুঁজিপতিরা হয়ে গেল সবকিছুর মালিক। শ্রমিকদের হাতে আর রইল না কিছুই। এইভাবেই বস্ত্রশিল্পে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সূচিত হল।

যন্ত্রপাতি ও কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথেই শিল্পোৎপাদনের সমস্ত শাখায়, বিশেষ করে পোশাক, মুদ্রণ শিল্প, মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্পে এই ব্যবস্থা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

কাজ ক্রমে ব্যক্তি শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকল। ফলে আগে যে কারিগর একাই কোনও একটি কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করত, এখন সে করে কাজের কেবল অংশবিশেষ মাত্র। এই শ্রমবিভাজন আরও সস্তায় ও দ্রুতহারে উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুত সম্ভব করে তুলল। এই শ্রমবিভাগ ব্যক্তি শ্রমিকের কাজকে পরিণত করল সরল ও অনবরত পুনরাবৃত্ত যান্ত্রিক ক্রিয়ায়। এই উৎপাদন কেবলমাত্র মেশিনের দ্বারা সম্ভব হল তাই নয়, তা আরও ভালভাবে সম্পন্ন হল। সুতাকাটা ও বয়নশিল্পে যা ঘটেছিল, সে ভাবেই একে একে শিল্পের সমস্ত শাখা বাষ্পশক্তি, যন্ত্রশক্তি ও কারখানা ব্যবস্থার আওতায় চলে এল।

এরই সাথে সমস্ত শিল্প বৃহৎ পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হল এবং শ্রমিকরা আগে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করত তার থেকে বঞ্চিত হল। বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিশাল বিশাল ওয়ার্কশপ খুলে যত বেশি বেশি করে দক্ষ ক্ষুদ্র হস্তশিল্পীদের উৎপাটিত করতে শুরু করল, ততই প্রকৃত উৎপাদন শিল্প শুধু নয়, এমনকি হস্তশিল্পজাত উৎপাদনও কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় চলে এল। এর ফলে পুঁজিপতিদের খরচ যেমন অনেক বাঁচল, তেমনই শ্রমবিভাজনকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ মিলল।

এই রাস্তাতেই বর্তমান যুগের সভ্য দেশগুলিতে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন পূর্বপ্রচলিত প্রায় সকল প্রকার শ্রম, হস্তশিল্প এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে, সমস্ত প্রকার শ্রমই ব্যয়িত হচ্ছে কারখানায়। এই ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে আগেকার মধ্যশ্রেণিগুলি, বিশেষত অপেক্ষাকৃত খুদে হস্তশিল্পীদের উত্তরোত্তর ধ্বংস করে দিয়েছে, সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে শ্রমিকদের আগেকার অবস্থান। দেখা দিয়েছে দু'টি নতুন শ্রেণি, যারা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণিকে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, এই শ্রেণি দু'টি হল ঃ

(১) বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি, এরা সমস্ত সভ্য দেশে ইতিমধ্যে প্রায় সামগ্রিকভাবেই জীবনধারণের সমস্ত সামগ্রীর এবং সেগুলি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আর কল-কারখানা ইত্যাদির উপর একছত্র দখল কায়েম করে ফেলেছে। এরাই হল বুর্জোয়া শ্রেণি বা পুঁজিপতি।

(২) সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন শ্রেণি, যারা তাদের বেঁচে থাকার উপায় ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এদেরই বলা হয় সর্বহারাশ্রেণি বা সর্বহারা।

প্রশ্ন ঃ বুর্জোয়াদের কাছে সর্বহারাদের এই শ্রম বেচা চলে কোন শর্তে?

উত্তর ঃ অন্য যে কোনও পণ্যের মতো শ্রমও একটা পণ্য এবং সে সব পণ্যের মতোই একই নিয়মে তার দাম স্থির হয়। আমরা দেখব— বৃহৎ শিল্প কিংবা অবাধ প্রতিযোগিতার রাজত্ব— উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম ভাবে— পণ্যমূল্য সবসময়ই মোটের উপর পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান। সুতরাং, শ্রমের মূল্যও শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের সমান।

কিন্তু শ্রম উৎপাদনের ব্যয় বলতে বোঝায়, সেই পরিমাণ জীবন ধারণের উপকরণের দাম, যতটুকু না হলে মজুর আগামী দিনে কাজ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং যা শ্রমিকশ্রেণিকে মরে শেষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু দরকার, শ্রমের দাম হিসেবে তার থেকে একটুও বেশি মজুর পাবে না। অন্য কথায়, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সবচেয়ে কম পরিমাণই হবে শ্রমের দাম বা মজুরি। যেহেতু ব্যবসা কখনও ভাল চলে, কখনও মন্দ, তার ওপর নির্ভর করে মজুর তার শ্রমের মূল্যও কখনও বেশি, কখনও কম পায়। কিন্তু আবার ঠিকভাবে ধরতে গেলে, একজন শিল্পপতির সময় ভাল চলুক বা মন্দ, গড়পড়তা পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় সে পণ্যের দাম কখনওই বেশি বা কম পায় না। অনুরূপে মজুরও গড়পড়তা ন্যূনতম মজুরির থেকে কম বা বেশি পায় না। বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের সমস্ত শাখার উপর যত বেশি পরিমাণে দখলদারি কায়েম করছে, তত কঠোরভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে মজুরির এই নিয়ম।

প্রশ্ন ঃ শিল্প-বিপ্লবের আগে কোন কোন মেহনতি শ্রেণি ছিল?

উত্তর ঃ সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্বে মেহনতি শ্রেণিগুলির জীবনযাত্রার পরিবেশ ছিল বিভিন্ন রকম। মনিব এবং শাসক শ্রেণিগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ছিল বিভিন্ন। প্রাচীনকালে মেহনতি জনগণ ছিল তাদের মালিকদের দাস, ঠিক যেমন এখনও তারা রয়েছে অনেক অনগ্রসর দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও।

মধ্যযুগে তারা ছিল ভূস্বামী অভিজাতকূলের অধীনস্থ ভূমিদাস, যেমনটা এখনও রয়েছে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং রাশিয়ায়। এর সাথে মধ্যযুগে এমনকি শিল্প-বিপ্লব পর্যন্ত ছিল পেটি-বুর্জোয়া মনিবদের কাজে নিযুক্ত শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পীরা। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রসারের সাথে ক্রমে ম্যানুফ্যাক্টরি (ছোট কারখানা) শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটেছিল। ধীরে ধীরে এখন তারাই বড় বড় পুঁজিপতিদের অধীনে কর্মরত।

প্রশ্ন ঃ দাসদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ একবারেই পুরোপুরিভাবে বিক্রি হয় দাস। সর্বহারা নিজেকে বিকোতে বাধ্য হয় প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়। একজন বিশেষ দাস, একজন বিশেষ মালিকের সম্পত্তি — আর কিছু না হলেও অন্তত মালিকের স্বার্থের খাতিরে এই দাসের জীবনধারণের উপায় নিশ্চিত থাকে, সেটা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক। একজন ব্যক্তি সর্বহারা মানুষ কার্যত গোটা বুর্জোয়া শ্রেণির সম্পত্তি, কারও প্রয়োজন হলেই কেবলমাত্র তার শ্রম কেনা হয়। ফলে তার বেঁচেবর্তে থাকার কোনও গ্যারান্টি নেই। শুধুমাত্র সামগ্রিক শ্রেণিগতভাবেই সর্বহারার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা আছে।

দাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়েতের অবস্থান সেটার মধ্যে। তাই এর যাবতীয় অনিশ্চিত ওঠা-পড়ার ফল তাকে ভুগতে হয়। দাস গণ্য হয় সামগ্রী হিসাবে, সমাজের একজন হিসাবে নয়। এর ফলে সর্বহারাদের তুলনায় তাদের টিকে থাকা হয়ত সহজ ছিল। যদিও সর্বহারা সংযুক্ত সমাজ বিকাশের একটা উচ্চতর স্তরের সঙ্গে। তার সামাজিক অবস্থানও দাসের চেয়ে উপরের স্তরে। সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানা সংক্রান্ত সম্পর্কের মধ্যে কেবল দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেই একজন ব্যক্তি-দাস মুক্তি পেয়ে সর্বহারায় পরিণত হতে পারে। অন্যদিকে সর্বহারা মুক্তি লাভ করতে পারে শুধু সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার দ্বারাই।

প্রশ্ন ঃ ভূমিদাসদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ উৎপাদনের একটা হাতিয়ার অর্থাৎ একটুকরো জমি থাকে ভূমিদাসের দখলে, যা সে ব্যবহারের অধিকারী। যার বিনিময়ে তাকে উৎপাদিত দ্রব্যের কিংবা পরিষেবা হিসাবে শ্রমের একাংশ দিতে হয়। সর্বহারা উৎপাদনের যে যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে সেটা অপরের, সে কাজ করে সেই অপরের সুবিধার জন্য, তার জন্য সে পায় উৎপাদনের একাংশ। ভূমিদাস দেয়, সর্বহারাকে দেওয়া হয়। ভূমিদাসের জীবনধারণের উপায়ের নিশ্চয়তা থাকে, সর্বহারার থাকে না। ভূমিদাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, সর্বহারার অবস্থান সেটার মাঝে। ভূমিদাস মুক্ত হতে পারে তিনটি উপায়ে — সে শহরে পালিয়ে গিয়ে সেখানে হস্তশিল্পী হয়ে উঠতে পারে, অথবা সামন্তপ্রভুকে শ্রম আর উৎপাদিত দ্রব্যের বদলে টাকা দিয়ে স্বাধীন প্রজায় পরিণত হতে পারে। না হলে সামন্ত প্রভুকে উৎখাত করে সে নিজেই হয়ে উঠতে পারে সম্পত্তির মালিক। এক কথায়, কোনও না কোনও উপায়ে সে এসে যায় মালিক শ্রেণি আর প্রতিযোগিতার মধ্যে। অপর দিকে, প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমস্ত শ্রেণিগত পার্থক্য লোপ করে মুক্ত হয় সর্বহারা। (চলবে)

সর্বহারা শ্রেণির মহান শিক্ষক এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

২৮ নভেম্বর মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মদিবসে কলকাতায় মার্কস-এঙ্গেলস মূর্তিতে মাল্যদান করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড সৌমেন বসু সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। পরে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও এঙ্গেলসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য (নিচের ছবি)

নন্দীগ্রাম বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন

বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, সকল মৌজায় নিকাশির ব্যবস্থা, বোরো চাষের জন্য উপকরণ সরবরাহ, সমস্ত গরিব মানুষের জন্য বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি নির্মাণের দাবিতে ২১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয় এস ইউ সি আই (সি)-র নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি

নদিয়ায় যুব উৎসব

২৩ ও ২৪ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র নদিয়া জেলা যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বারুইপাড়ায় শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতি ভবনে। উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই (সি) নদিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অঞ্জন মুখার্জী।

বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, মদ ও মাদক দ্রব্য বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি ভলিবল, ফুটবল, রোডরেস, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বক্তব্য ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড মশিকুর রহমান ও সভাপতি কমরেড শীতল দে।

হুগলিতে আইসিডিএস কর্মীদের বিক্ষোভ

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই, অবসরকালীন পেনশনের দাবিতে এবং প্রকল্পটি এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে কর্মীরা আন্দোলনে নেমেছেন। ১৯ দফা দাবিতে হুগলি জেলাশাসক দপ্তরে ১৮ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে দু-হাজারের অধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । ১৬ টি ব্লক থেকে কর্মীরা সমবেত হন। জেলা সভাপতি শিপ্রা মিত্র, রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিতের নেতৃত্বে অতিরিক্ত জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক কমরেড তপন দাস বক্তব্য রাখেন।

বিদ্যুৎপর্ষদ পার্টটাইম সুইপার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন

২৪ নভেম্বর কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ পার্টটাইম সুইপার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সংগঠনের সভাপতি পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, আমাদের সংগঠনের ২০ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে চাকরি সংক্রান্ত কিছু স্থায়ীত্বের দাবি আদায় হয়েছে। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সরকারের যে চূড়ান্ত অবহেলা তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিদ্যুৎ শ্রমিক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা সমর সিনহা অসুস্থ থাকায় তাঁর ভাষণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রতিনিধিদের শোনানো হয়। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠক প্রবীর মাহাতো। সনাতন মাহাতোকে সভাপতি এবং মানস সিনহাকে সম্পাদক করে ২০ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গু মোকাবিলার দাবি পানিহাটিতে

রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতোই উত্তর ২৪ পরগণার পানিহাটি অঞ্চলেও ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে ২৮ নভেম্বর পানিহাটি জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে পৌরদপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শুধু সরকারি তথ্য অনুযায়ী ওই এলাকায় ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ১২১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বাস্তবে সংখ্যা আরও অনেক বেশি। ইতিমধ্যেই এক জনের মৃত্যু হয়েছে (পনেরো নং ওয়ার্ড)। আগরপাড়া নর্থ ও সাউথ স্টেশন রোডের মধ্যে (চার নং ওয়ার্ড) ৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের রক্তের রিপোর্ট স্বাস্থ্য আধিকারিককে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্তদের এলাকায় মশা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছেন।

পৌর কর্তৃপক্ষ লোকাভাবের অজুহাত তুলেছে। পানিহাটি জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ডাক্তার স্বপন বিশ্বাস বলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা দরকার, অথচ সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে ডেঙ্গু মোকাবিলা করার দাবি জানানো হয়।

অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, জি এস টি ৭ শতাংশ কমেছে। এই প্রেক্ষিতে বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানোর দাবি তুলেছে অ্যাবেকা। কয়েকটি রাজ্যের মতো এ রাজ্যে বিনামূল্যে কৃষি বিদ্যুৎ, দিল্লির মতো এ রাজ্যে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত গৃহস্থ গ্রাহকদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দবিতে অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ষোড়শ সম্মেলন ২৪ নভেম্বর কাঁথি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, জেলা সম্পাদক শংকর মালাকার, অফিস সম্পাদক প্রণব মাইতি, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান প্রাক্তন শিক্ষিকা বাসন্তী জানা।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্মেলনে ২৬ টি সাপ্লাই অফিস এলাকা থেকে ৩১৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক জয়মোহন পালকে সভাপতি, প্রদীপ দাসকে সম্পাদক, নারায়ণচন্দ্র নায়ককে অফিস সম্পাদক করে ৬৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের কনভেনশন ভাটপাড়ায়

৩০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের ডাকে ভাটপাড়া পৌরসভায় কনভেনশন হয়। ভাটপাড়া ছাড়াও নৈহাটি, উত্তর ব্যারাকপুর, নিউ ব্যারাকপুর ও কল্যাণী পৌরসভার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগ দেন। নৈহাটি ও ভাটপাড়া পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা কমিটি গঠন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু এবং যুগ্ম সম্পাদক পৌলমি করঞ্জাই ও কেকা পাল সহ রাজ্য কমিটির সদস্য ঈশ্বর সরকার, নারায়ণ শর্মা, শিবানী মুখার্জী প্রমুখ।

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের নেতা সঞ্জিত বিশ্বাস স্মরণসভা

২৮ নভেম্বর মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, অ্যাবেকার সভাপতি প্রয়াত সঞ্জিত বিশ্বাস স্মরণসভায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিদ্যুৎগ্রাহকরা সমবেত হন। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন

বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, প্রখ্যাত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সিইএসসি-র প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ বসু প্রমুখ। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় শারীরিক কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর পাঠানো লিখিত বক্তব্য সভায় পাঠ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অ্যাবেকার সহসভাপতি মধুসূদন মান্না। সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি অমল মাইতি প্রয়াত সঞ্জিত বিশ্বাসের অপূরিত কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে আন্দোলন মধ্যপ্রদেশে

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে মধ্যপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি) ১৬-২২ নভেম্বর প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রেল, বিএসএনএল, এয়ার ইন্ডিয়া, বিপিসিএল, ওএনজিসি, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, গেইল, ভেল প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর ফলে জনস্বার্থ কীভাবে লংঘিত হবে তা ব্যাখ্যা করে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে কয়েকশো পথসভা সংগঠিত হয়। গুনা, গোয়ালিয়র, অশোকনগর (ছবি), দিবাস,

ইন্দোর, সাগর, ভোপাল, জবলপুর, শিবপুরি, আলিরাজপুর প্রভৃতি জেলায় শ্রমিক বস্তিতে, বিভিন্ন কলোনিতে হাজার হাজার হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়। ২২ নভেম্বর প্রধান প্রধান শহরে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি শ্রমিক এবং বাম-গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

কাজের নিরাপত্তার দাবিতে শ্রমিক সম্মেলন

হাওড়া ঃ এআইইউটিইউসি-র চতুর্থ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৬ নভেম্বর, বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি হলে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ এবং

রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বিলগ্নিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ সহ বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদের মধ্যে আশাকর্মী, আই সি ডি এস, মিড-ডে মিল কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কমরেড অলোক ঘোষকে সভাপতি, কমরেড জৈমিনি বর্মনকে সম্পাদক এবং কমরেড শ্রীদাম গোপমণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ ২৪ নভেম্বর এআইইউটিইউসি-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কয়লা, ইস্পাত, লোকোমোটিভ, রেল, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, নির্মাণ ও মোটর ভ্যান শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী, এবং সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে সুবিধাবাদ, অর্থনীতিবাদ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে মুক্ত করা এবং পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

পরিপূরক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। তাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে
১২টি কেন্দ্রে লড়ছে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)

১। পটকা - দিকু বেসরা
২। ঘাটশিলা - বিজন সরদার
৩। বহরাগোড়া - আশারানি পাল
৪। জামশেদপুর পূর্ব - বান্টি সিং (সমর্থিত)
৫। ইছাগড় - নেপাল কিস্কু
৬। রাঁচি - মিন্টু পাসওয়ান
৭। চন্দনকিয়ারি - অনিল বাউরি
৮। বোকারো শহর - মনোজ কুমার সিং
৯। চাইবাসা - নীতিন রোশন এক্কা
১০। মনোহরপুর - দীনেশ চন্দ্র বইপাই
১১। ভবনাথপুর - বিনয় বিশ্বকর্মা
১২। গোড্ডা - শ্যামাকান্ত যাদব

ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করতে চলছেন দলের প্রার্থীরা

ঘূর্ণিঝড়ের একমাস পরেও বহু গ্রামে বিদ্যুৎ নেই
আন্দোলনে অ্যাবেকা

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বেশ কিছু গরিব মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। বিপুল পরিমাণ কৃষিজ-বনজ সম্পদ এবং জনপদের ক্ষতি হয়েছে। হাজার হাজার বিদ্যুতের খুঁটি এবং বহু ট্রান্সফরমার ভেঙে পড়েছে। মাসাধিক কাল পরেও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, কুলতলী, জয়নগর-২ ব্লকের বহু এলাকা বিদ্যুৎহীন। বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতে অসহায় মানুষদের থেকে টাকা চাইছে বিদ্যুৎ অফিসের লোক, সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা।

অবিলম্বে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানো সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৫ নভেম্বর অ্যাবেকা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে অসংখ্য মানুষ বারুইপুরের পদ্মপুকুরে রিজিওনাল ম্যানেজার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটির অভাব না থাকলেও সেগুলো দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি ও সমস্যার কথা তিনি স্বীকার করেন। তিনি দুর্নীতি বন্ধ করার ও দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি দিব্যেন্দু মুখার্জী এবং জেলা সম্পাদক রামচন্দ্র সাহু।

এ অন্ধকারের শেষ কোথায়

শহর কলকাতার কালীঘাট। ১৩ ও ১৫ বছরের দুটি ফুটপাতবাসী মেয়ে সামান্য কিছু পয়সার আশায় মাটি কাটতে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। সেখানেই তিনজন তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায়, তাদের একজন নাবালক। ছোট মেয়েটি মন্দিরে ভিক্ষা করে। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেলে মেয়েটির মা'র প্রশ্ন, পুলিশ ওকে রেখে দিলে আমরা খাব কী? শপিং মল, ফ্লাইওভারের আলোকমালায় সাজানো কলকাতার বুকেই এ এক অন্য কলকাতা। অভাবের কামড় সেখানে এমনই মর্মান্তিক। ডিজিটাল ভারত— 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর সরকারি বিজ্ঞাপনকে এ অন্ধকার ভারত বড় বিদ্রূপ করে।

ঘটনার পর দিনই হায়দরাবাদে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ

রাঁচিতে ভিআইপি জোনের মধ্যে বন্দুক ঠেকিয়ে এক কলেজ ছাত্রীর উপর অত্যাচার চালিয়েছে একদল ধর্ষক। হায়দরাবাদে পশুচিকিৎসক তরুণীর নিত্যদিনের যাতায়াতের রাস্তায় তাঁকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অত্যাচার চালিয়েছে একদল নরপশু। তারপর গলা টিপে মেরে ২৫ কিলোমিটার দূরে পেট্রল ঢেলে তাঁর দেহ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করেছে। পরিবারের সদস্যরা দেহ শনাক্ত করেছেন মেয়েটির স্কার্ফ দেখে। দুর্বৃত্তরা জেনে উল্লাসে চিৎকার করে উঠবে যে, পুলিশ মৃতের বাবার নিখোঁজ ডায়েরিই নিতে চায়নি। অত্যাচারিত, ধর্ষিত নারীর আর্তনাদ প্রতি মুহূর্তে দেশের বাতাসকে ভারী করে তুলছে। প্রশ্ন উঠছে— এ কোন সভ্যতা?

কলকাতার কালীঘাট থানায় বিক্ষোভ

মেদিনীপুর শহরে ডিএম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

ঘটনা বাড়ছে, উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে চলেছে অভিযুক্ত নাবালকের সংখ্যাও। কেন? কেন্দ্রে-রাজ্যে যে সরকারই গদিতে বসুক, মহিলাদের নিরাপত্তা এভাবে প্রহসনে পরিণত হচ্ছে কেন? প্রায় প্রতিটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে অভিযুক্তরা মদ্যপ। মদ খেলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায় — এই সহজ সত্যটা সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা তাঁদের অভিজ্ঞতায় জানেন। কিন্তু কোনও সরকারই তা স্বীকার করতে চায় না। সরকার মদ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এবং রাজস্বের লোভে যথেচ্ছ মদের লাইসেন্স দিচ্ছে। নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্য, মদ খেয়ে মাতাল না হলেই হল। সরকারের প্রশ্রয়ে মদের দোকানে ভিড় বাড়াচ্ছে ছেলে-বুড়ো সকলে। সরকারি রাজস্ব চড়চড় করে বাড়ে বছর বছর, সেই হারে বাড়ে খুন-ধর্ষণ, অপরাধমূলক কাজ। প্রতি ২০ মিনিটে দেশে একজন নারী ধর্ষিতা হন। অত্যাচারিত নারীরা বোবা কান্নায় গুমরে মরে। কিন্তু তা ব্যবসায়ীদের মুনাফায় যেমন বাধা সৃষ্টি করে না, তেমনই বেড়ে চলে সরকারের 'জনপ্রিয়তা'ও!

মদ ছাড়াও ছোট থেকেই 'অপরাধী' হওয়ার নানা উপকরণ সমাজে নাবালকদের সামনে মজুত। জনমতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে যেমন সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, তেমনই পর্নোগ্রাফি এবং ব্লু-ফিল্মের রমরমাও চলছে রাজ্য তথা দেশজুড়ে। সর্বত্র নারীদেহ পণ্য। তার বিপণন চলছে অবাধে। পুরুষ-নারীর সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ককে কদর্য করে তুলছে এই পুঁজিবাদী সমাজ। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত কোনও মূল্যবোধ শিশু বয়স থেকে গড়ে ওঠার পরিবেশ আজ ক্রমেই বিলীয়মান। মহিলাদের সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ গড়ে ওঠার পরিস্থিতিও অনুপস্থিত। মহিলা মানেই ভোগের বস্তু, তা যে বয়সেরই হোক— এমন কদর্য ভাবনার চোরাস্রোত বইছে সমাজ অভ্যন্তরে। এই অবস্থায় শুধু কিছু আইন করে অত্যাচারের সংখ্যা ও ভয়াবহতা কমানো যেতে পারে না। অভিযুক্তদের বেশিরভাগেরই শাস্তি হয় না, কোথাও হলেও তা নামমাত্র। প্রশাসনের এই ঢিলেঢালা মনোভাবও এ ধরনের ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ঘরে-বাইরে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভয়াবহতাও। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার গদি নিয়ে যে পরিমাণ লড়ালড়ি করে, মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে তার অংশমাত্র সোচ্চার হতে দেখা যায় না তাদের। তারাই দুষ্কৃতীদের লালন-পালন করে, প্রশ্রয় দেয় ভোটের স্বার্থে। উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে কিশোরী ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের শাস্তি দূরের কথা, দল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করতে চায়নি বিজেপি। ওই নির্যাতিত তরুণীর গোটা পরিবার এবং ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীকে পর্যন্ত ট্রাক চাপা দিয়ে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। গোয়ার এক বিজেপি সাংসদ নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত। সরকার, রাজনৈতিক দলগুলি দুষ্কৃতীদের পক্ষ নেওয়ায় বহু ক্ষেত্রে নির্যাতিত মহিলার পরিবারকেও অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়, নিরাপত্তার বদলে জোটে পুলিশি জেরার হয়রানি।

পরিস্থিতি যে কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষেই অসহনীয় হয়ে উঠছে, অথচ ক্ষমতার মসনদে বসা নেতা-মন্ত্রীরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। এ রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাগুলি নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতিটুকু দেবার সময় পর্যন্ত পাননি। হায়দরাবাদের নারকীয় ঘটনার পর তেলেঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্টে নির্যাতিতাকে দায়ী করে বলেছেন, নির্যাতিতা কেন পুলিশকে ফোন না করে তাঁর বোনকে ফোন করছিলেন। সারা দেশে নারী নিরাপত্তার যখন বেহাল দশা, তখন কথায় কথায়

কোচবিহারে বিক্ষোভ

টুইট করা প্রধানমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। প্রবল জনআন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার নারী-নিরাপত্তার স্বার্থে 'নির্ভয়া-ফান্ড' তৈরি করতে বাধ্য হলেও রাজ্যে রাজ্যে তার টাকা কিছুমাত্র খরচ না হয়ে পড়ে আছে। অথচ কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের এ সংক্রান্ত কোনও নজরদারি নেই। এই নির্লজ্জ, নির্বিকার ঔদাসীন্যই বুঝিয়ে দেয়, ভোটের আগে এরা যতই জনদরদের বুলি আওড়াক, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা এমনকি মহিলাদের সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা দেওয়ার মতো সভ্যতার ন্যূনতম শর্তটুকু রক্ষার ক্ষেত্রে এদের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ বা আন্তরিকতা নেই।

এ লড়াই তাই জনগণেরই লড়াই। দেশের প্রান্তে প্রান্তে ধিক্কার জানিয়ে পথে নেমে আসছেন ছাত্র-যুবক-মহিলা, সর্বস্তরের মানুষ। কারও জন্য অপেক্ষা না করে দিল্লিতে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভে বসে পড়েছেন ছাত্রী অনু দুবে। তিনি বলেছেন, 'আজ ওই তরুণীকে পুড়ে মরতে হয়েছে, কাল আমি এভাবে পুড়ে মরতে চাই না।' তিনি বলেছেন, 'আমি কোনও দিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করব ভাবিনি, কিন্তু হায়দরাবাদের ঘটনায় আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না।' দিল্লি পুলিশ তাকে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গেছে, সেখানে নির্যাতন চালিয়েছে। তাতে প্রতিবাদের আগুন আরও ছড়িয়ে গিয়েছে দিকে দিকে। রাজধানী দিল্লি সহ রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ হয়েছে, হায়দরাবাদে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। কলকাতায় ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়েছে, কালীঘাট থানায় ডেপুটেশন দিয়েছে। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে— সরকারকে অবিলম্বে নারী নিরাপত্তার কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠিক যেভাবে অনুর মতো কিশোরী রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে একা প্ল্যাকার্ড হাতে সংসদের সামনে ধর্নায় বসেছেন, সেই দৃঢ়তা নিয়ে আজ প্রতিটি মানুষকে এমন প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে একদিকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে সরকারগুলিকে বাধ্য করতে হবে— মহিলাদের সুস্থ ভাবে বাঁচার পরিস্থিতি তৈরিতে, দুষ্কৃতীদের দমনে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। দিশাহীন যে উদ্ভ্রান্ত যুবকরা, বখাটেরা এমন বর্বরতায় নিজেদের যৌবনকে শেষ করছে, তাদের সামনেও তুলে ধরা দরকার যথার্থ জীবনবোধ কী।

কলকাতার সরশুনায় নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের দাবিতে এমএসএস-এর বিক্ষোভ মহেশতলা থানায়। ২৮ নভেম্বর

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৮)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগর

নানা কৃতিত্ব এবং চরিত্রের গুণাবলি শুনে বিদ্যাসাগরের দেখা পাওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ বেশ কিছু দিন ধরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এক শিষ্য মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম)-র সূত্রে ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট তিন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এলেন রামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৬২ আর রামকৃষ্ণের ৪৬। এই সাক্ষাতের বিস্তৃত বর্ণনা আছে শ্রীম-র 'কথামৃত' বইতে।

প্রবেশের পর বাড়িটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় মুগ্ধ হলেন রামকৃষ্ণ। আর দেখলেন বাড়িতে কোথাও বিলাসিতার কোনও চিহ্ন নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় এ বাড়িতে যিনি থাকেন বিলাসিতাকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। সমস্ত ঘরে, আলমারি-তাকে অসংখ্য বইপত্র সুন্দর ভাবে সাজানো। টেবিল-ভর্তি চিঠি, নানা জন নানা ধরনের সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন। সেদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছিলেন রামকৃষ্ণ। পুরো সময়টা তিনিই নানা বিষয়ে কথা বলেছেন, গান গেয়েছেন, বিদ্যাসাগরের দেওয়া নানা রকমের মিষ্টি পেটভরে খেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের জ্ঞান, করুণার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত কথা শান্তভাবে শুনেছেন, তাঁর হাসি-মস্করার সূত্রে দু-একটা সরস কথা বলেছেন। যাওয়ার সময় রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে বলেছেন, "একবার বাগান দেখতে যাবেন। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।"

রামকৃষ্ণ জানতেন, বিদ্যাসাগর ধর্ম মানেন না, পূজার্চনা করেন না। তাই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁকে যেতে বলেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে সেখানে একদমই যাবেন না, সম্ভবত রামকৃষ্ণ তা ভাবতে পারেননি এবং সেজন্য কিছুটা দুঃখও পেয়েছেন। দুঃখ থেকে মহেন্দ্র মাস্টারকে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর সত্য কয় না কেন? ... সেদিন বললে, এখানে আসবে। কিন্তু এল না।" বিদ্যাসাগর মিথ্যা বলেছেন তা নয়। আমন্ত্রণের উত্তরে সৌজন্যবশতই বিদ্যাসাগর যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। ব্যক্তিগত জীবনে এই আচরণের একটা দিক আছে— কোনও ধর্মস্থানেই তিনি যাবেন না। জীবনে কখনও কোনও ধর্মস্থানেই তিনি যাননি। বিদ্যাসাগর এরকমই নীতিনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনের কর্মব্যস্ত দিনেই শুধু নয়, রোগাক্রান্ত পীড়িত অবস্থাতেও এ ব্যাপারে এতটুকু দুর্বলতার পরিচয় দেননি। কলকাতার বাড়িতে কঠিন রোগে আক্রান্ত বিদ্যাসাগরের রোগমুক্তির কামনায় তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসী কন্যা হোমের আয়োজন করায় তিনি বাধা দেননি। কিন্তু নিজে দোতলার ঘর থেকে নেমে একতলায় হোমের ঘরটিতে পদার্পণ করেননি। কন্যার বহু পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিলেন, "মা, এইখানেও বড় ধোঁয়া আসছে, মনে দুঃখ করিস না।" এই 'বড় ধোঁয়া' কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। অর্থাৎ সবটাই ধোঁয়া। আর কিছু নেই। যখন কাশীতে গিয়েছিলেন বাবা-মার সাথে দেখা করতে, পাণ্ডারা ঘিরে ধরেছিলেন মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য। তিনি তাঁদের বলেছেন, 'আমি বিশ্বনাথ দর্শন করতে এখানে আসিনি। এসেছি বাবা-মা'কে দেখতে। তাঁরাই আমার ঈশ্বর।'

সে যুগে শিক্ষিত যুক্তিবাদী বলে পরিচিত বহু মানুষ রামকৃষ্ণের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকেও কাছে পেতে চেয়েছিলেন। না পেয়ে অভিমান করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তিনি বুঝেছিলেন। তিনি তাঁর মতো করে মানুষ চিনতে পারতেন। তিনি নিছক সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী পুরোহিত ছিলেন না। তাঁর মধ্যেও মানবতাবাদের ছাপ ছিল, তবে তার সঙ্গে মিশে ছিল প্রবল অধ্যাত্মবাদ। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত, সেকুলার হিউম্যানিস্ট। মানবতাবাদী পরিমণ্ডলের মধ্যে দুজনের জীবনদৃষ্টিতে গুণগত প্রভেদ ছিল। তাই অনেককে প্রভাবিত করলেও বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণ প্রভাবিত করতে পারেনি। বিদ্যাসাগরকে তিনি তাঁর ঢঙে 'সিদ্ধপুরুষ' বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, 'আমি সিদ্ধপুরুষ?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তোমার মনটাও তো নরম।

তাই তুমি সিদ্ধপুরুষ।'

শ্রীম একদিন রামকৃষ্ণকে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বলেন, চেঙ্গিস খাঁ লুঠপাট করল, এক লক্ষ বন্দিকে কেটে ফেলল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না!" উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন, "ঈশ্বরের কার্য কী বোঝা যায়, ... তিনি কেন সংহার করেন আমরা কি বুঝতে পারি? আমি বলি, মা আমার বোঝবারও দরকার নেই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও।" বলবাহুল্য, এ হল ভক্তিমার্গ, যুক্তিমার্গ নয়।

রামকৃষ্ণ যখন বললেন, ব্রহ্ম কী, তা জানা যায় না। তাই ব্রহ্ম হল অনুচ্ছিষ্ট। বিদ্যাসাগর এ নিয়ে তাঁকে কিছুই বলেননি, সম্ভবত আহত হতে পারেন ভেবে। শুধু বলেছিলেন, 'অনুচ্ছিষ্ট? বাঃ আজ একটা নতুন কথা শিখলাম।' কিন্তু পরে শ্রীম যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, 'ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার মত কী? বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'তাঁকে জানাই যখন যায় না তখন আমাদের কর্তব্য কী? আমাদের কর্তব্য হল সমাজের উন্নতির জন্য এমন কাজ শুরু করা, যাতে ক্রমে এই পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হল সমাজকল্যাণের জন্য কাজ করা।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে সময়কালে বলেছেন, দেশের লোক ধর্মানুগত, তাই তাদের শিক্ষা দিতে হবে ধর্মের পথে এবং তাদের শেখাতে হবে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করতে, তার অনেক আগেই, আধুনিক নবজাগ্রত চিন্তার ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "ধর্ম যে কী, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনও প্রয়োজন নাই। ... আমার বোধ হয় যে, পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ কাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ এ তর্ক থাকিবে, কস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবে না।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ২৩১-২৩২)। তাই, বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়।" ('বাল্যবিবাহের দোষ', ১৮৫০)। আর এই বিদ্যার্জনের প্রশ্নে তিনি বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও অনধিকার চর্চা করা শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।" (বেথুন স্কুলের সম্পাদক থাকাকালীন সরকারের সচিব এ. ইডেনের কাছে দেওয়া ২২ দফা প্রস্তাবের ১৬ নং প্রস্তাব। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২)। অর্থাৎ, ধর্ম ব্যাপারটাকে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন এবং ধর্মীয় ভাবধারা থেকে মুক্ত যুক্তি, পরীক্ষিত সত্য এবং বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই চলতে চেষ্টা করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃত সত্তা আছে কি নেই, সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রচেষ্টার খুব প্রয়োজন নেই। পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তা প্রসারের জন্যই তিনি আজীবন আপসহীন সংগ্রাম করেছেন।

'মন ভোগবাসনা-মুক্ত হলে আর কোনও দুঃখ-দুর্দশা-অশান্তি থাকবে না'— রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে যুগ-যুগান্তের এই ধর্মীয় বিশ্বাস বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ সারা দেশ ঘুরেছেন। দেশের কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দেখে, ধর্মের নামে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার দেখে বিবেকানন্দের চোখ থেকে জল পড়ত। গভীর যন্ত্রণায় তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনও ধর্ম এরূপ করে না।" (সূত্র : বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস)। তাই তিনি ধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন এবং ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই বরাবর করে গেছেন। 'আমি বেদের ততটুকুই মানি যতটুকু যুক্তিসম্মত'— বিবেকানন্দ এমন কথা বললেও সমাজসত্য সম্পর্কে সামগ্রিক অর্থে তিনি বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদ গ্রহণে সক্ষম হননি। কিন্তু যেহেতু তাঁর চরিত্রে ছিল সংস্কারমুক্ত প্রবণতা এবং গভীর মানবদরদ তাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব সম্ভবত তিনি ভোরের আলোর উষ্ণতার মতো অনুভব করেছিলেন। শেষজীবনে বিবেকানন্দ এও বলেছিলেন, "এখন ভারতে আধুনিক যুগ। কীভাবে জনগণের মধ্যে সেকুলার জ্ঞানের বিস্তার হয়, সেটাই গুরুতর প্রশ্ন।" (জনগণের অধিকার, পৃ. ৬২)। আজীবন অদ্বৈত বেদান্তবাদী থাকা সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেকানন্দের এহেন উপলব্ধির পিছনে সে যুগে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারেননি ঠিকই কিন্তু, ঘটনাক্রমে মনে হয়, দেশের সমাজ-পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে এসে বিদ্যাসাগরকে তিনি নিজের হৃদয়ের অন্যতম শিক্ষক করে নিয়েছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই আলমোড়ায় মৃত্যুর আগের দিন ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছেন, 'রামকৃষ্ণের পর বিদ্যাসাগরকেই আমি অনুসরণ করেছি।' বিবেকানন্দ এ-ও বলেছেন, 'উত্তর ভারতে আমাদের সময়কার এমন কোনও যুবক নেই যার উপর বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়েনি।' বিদ্যাসাগরের এই প্রভাবে বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনবোধ প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, একথা বলায় আর কোনও বাধা থাকে না। সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছেন, "এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।" (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭২)। এছাড়াও, ধর্মসাধনার যে প্রধান কথা, মোক্ষলাভ, সে প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ শিষ্যদের বলেছেন, "নিজের সুখ ও মোক্ষলাভের কথা না ভেবে সমগ্র জাতির কথা ভাবো। সকলের মুক্তি না হলে নিজের মুক্তি চাওয়া স্বার্থপরতা।" (সূত্র : বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস)। এই যে বিরাট কথা বিবেকানন্দ বললেন, এই শিক্ষাই তো বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। নিজের সারাটা জীবন অন্যের জন্য উজাড় করে দিয়ে বিদ্যাসাগরই তো বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" বলেছিলেন, "চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে 'ভগবান-ভগবান' করবে— এমন ভগবৎপ্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না...।

(চলবে)

বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষে ২৫ কিমি পদযাত্রা

২৪ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ীতে বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি, কথাবলা পাঠাগারের পক্ষ থেকে রজনীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে ২৫ কিমি পদযাত্রা শুরু হয়। টিউলিপ কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানানো হয়। নভেম্বর মাসে পিতার সাথে বিদ্যাসাগরের পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা শুরু ঘটনার স্মরণেই এই পদযাত্রা। কেশিয়াড়ী, কুকাই, পাঁচিয়াড়, ভীমমেলা, দেউলী হয়ে বেলদাতে পদযাত্রা পৌঁছায়। ভীমমেলা ও পাঁচিয়াড়ে নাগরিকবৃন্দ সম্বর্ধনা জানান। বেলদাতে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদানের পর কানপুর কথাবলা পাঠাগার ও বিরসা মুণ্ডা স্মৃতি শিক্ষা নিকেতনে পৌঁছে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্যরা। শেষে একটি আলোচনাসভা হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

হায়দরাবাদে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে ২৬-২৯ নভেম্বর এ আই ডি এস ও-র নবম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। প্রকাশ্য সমাবেশে দশ হাজারের বেশি ছাত্র প্রতিনিধি যোগ দেয়। দেশ-বিদেশের মনীষীদের উদ্ধৃতি ও সংগঠনের দীর্ঘ আন্দোলনের চিত্র প্রদর্শনী উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি চন্দ্রকুমার।

প্রকাশ্য সমাবেশের সভামঞ্চ তেলুগু নবজাগরণের প্রাণপুরুষ কান্দুকুরি বিরাসালিঙ্গমের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি এল বিশ্বেশ্বর রাও। বিশেষ অতিথি ছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবিভার্মা কুমার এবং বিজেপি সরকারের নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগী আইএএস অফিসার কান্নন গোপীনাথন। মিঃ গোপীনাথন কেন্দ্র সরকারের অঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে দেশব্যাপী দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের আহ্বান জানান। ওই দিন দ্বিতীয় পর্বে 'বামপন্থী যুক্ত আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিনে ২৬টি রাজ্য থেকে আগত আড়াই হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আইআইটি বোম্বের প্রাক্তন অধ্যাপক সমাজকর্মী রাম পুনিয়ানি (ছবি), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আর মনিভান্নান তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চেলমেশ্বর ও হায়দরাবাদের নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফয়জান মুস্তাফা ভিডিও-বার্তা পাঠান। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এস ইরফান হাবিব লিখিত বার্তা পাঠান। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজন গুরুকুল বার্তা পাঠান। হায়দরাবাদের সিয়াসত সংবাদমাধ্যমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জহিরুদ্দিন আলি খান, সর্বভারতীয় সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ সাত্তার আলি খান বক্তব্য রাখেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড কমল সাঁই।

প্রতিনিধি অধিবেশন চলে ২৯ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত। মূল প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাবের উপর ছাত্র প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। শেষে সৌরভ ঘোষকে সম্পাদক এবং ভি এন রাজশেখরকে সভাপতি নির্বাচন করে ১৪২ জনের সর্বভারতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত ছাত্রপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

পরিকাঠামো উন্নত করেই প্রাথমিকে পঞ্চম চালুর দাবি

২২ নভেম্বর রাজ্য সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করার নির্দেশিকা জারি করেছে। শিক্ষকদের অভিমত, এমনিতেই পরিকাঠামোহীন স্কুলগুলি এর ফলে আরও সমস্যায় পড়বে। শিক্ষায় একদা প্রথম স্থানে থাকা এ রাজ্য আজ পিছনের সারিতে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করে বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে শিশু শ্রেণি চালু করে ছিল। ফলে ৫টি ক্লাস চলছে, অথচ বেশির ভাগ স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ২/৩ জন। অভাব অশিক্ষক কর্মী, সাফাই কর্মীর। ওই শিক্ষক দিয়েই চলছে মিড ডে মিল সহ প্রতিদিনের কাজ ও ভোটের কাজ, জনগণনার মতো স্কুল-বহির্ভূত কাজ। ফলে শিক্ষাদানটাই হয়ে পড়েছে গৌণ।

দীর্ঘ ৪০ বছর পাশ-ফেল নেই, সিলেবাস নিয়েও রয়েছে বহু অভিযোগ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটা প্রহসনে পর্যবসিত। অভিভাবকরা সরকারি স্কুলগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যার জেরে প্রায় ৩ হাজার প্রাথমিক স্কুল উঠে গেছে। খোদ কলকাতায় ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি চালু করলে অভিভাবকদের বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকতে আরও বাধ্য করা হবে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ সহ পরিকাঠামোর উন্নতি করেই পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকে যুক্ত করার দাবি করেন।

মেট্রো রেলে ভাড়া বৃদ্ধি অনুচিত

নেতাজিভবন মেট্রো স্টেশনের সামনে প্রতিবাদ সভা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কলকাতা মেট্রো রেলের ভাড়া দ্বিগুণ করে দিল। ভাড়ার নতুন হার অনুযায়ী ৫ টাকায় ২ কিমি পর্যন্ত যাওয়া যাবে। অথচ, নোয়াপাড়া থেকে দমদম, দমদম থেকে বেলগাছিয়া সহ বেশ কিছু পরপর দু'টি স্টেশনের দূরত্বই ২ কিমির বেশি। সে কারণে, দিনপ্রতি প্রায় সমস্ত যাত্রীর ন্যূনতম ১০ টাকা খরচ বেড়েছে। নিত্যযাত্রীদের ক্ষেত্রে মাসে ২৬ দিন যাতায়াত ধরলে অতিরিক্ত খরচ ন্যূনতম ২৬০ টাকা বাড়ছে। এসইউসিআই(সি) দল এই ভাড়াবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের জন্য ঘোষণার দিন থেকেই আন্দোলন চালাচ্ছে।

কেন এই ভাড়াবৃদ্ধি? মেট্রোর যাত্রীসংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। সেই অনুযায়ী বাড়ছে তার আয়ের পরিমাণ। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে কলকাতা মেট্রোর আয় বেড়েছে ৪.৩২ শতাংশ। তাহলে ভাড়াবৃদ্ধি করা হল কেন?

এমনিতেই সাধারণ মানুষ চরম মূল্যবৃদ্ধির চাপে দিশেহারা। যখন প্রায় প্রতিদিন কোনও না কোনও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বেকার, কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে মরছে, তখন এই ভাড়াবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের উপর মারাত্মক আঘাত। এটা তো স্পষ্ট যে, এই ভাড়াবৃদ্ধি বহু মানুষকে মেট্রো ব্যবস্থার বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে। জনস্বার্থ নিয়ে সরকারের ন্যূনতম ভাবনা থাকলে এভাবে তারা মানুষের ঘাড়ে ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপাতে পারত কি?

মেট্রো রেল উচ্চবিত্তের বিলাসবাহন নয়। দ্রুত যাতায়াতের জন্য গরিব ঠিকা শ্রমিক, সেলসম্যান থেকে শুরু করে হাজার হাজার মানুষ মেট্রো ব্যবহার করে কর্মস্থলে যাতায়াত করেন। এর উপর নির্ভর করে অসংখ্য পরিবারের অন্নসংস্থান। ফলে মেট্রোর এই ভাড়াবৃদ্ধি এই সমস্ত মানুষের রুটিরুজিতে টান দেবে। সমাজে নতুন করে সংকট তৈরি হবে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা করছাড় দিয়েছে। আবাসন শিল্পের জন্য প্রোমোটারদের ২৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ মকুব করে দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার মন উদার, হস্ত দরাজ। এসব টাকা তো দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকা। অথচ পরিবহণের ভাড়া বাড়িয়ে সেই সাধারণ মানুষের পকেট কাটতে সরকারের এতটুকু বাধল না! এর চেয়ে অন্যায়, অনৈতিক আর কী হতে পারে?

মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা ছ'বছর ভাড়া বাড়ায়নি, তাই এখন বাড়ানোটা যৌক্তিক। অথচ গত ছ'বছরে যাত্রীদের যে দুর্ভোগ তারা বাড়িয়েছে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চুপ কেন? ছ'বছর আগে তারা পরিষেবা উন্নয়নের কথা বলেছিল। বাস্তবে তার কিছুমাত্র কি হয়েছে? কলকাতা মেট্রোয় দিনে গড়ে ৭ লক্ষের বেশি যাত্রী যাতায়াত করেন। তাঁদের দুর্ভোগের সীমা নেই। প্রায়ই মাঝরাস্তায় রেক খারাপ হচ্ছে, আলো-পাখা-এসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা এসির জলে কামরা ভেসে যাচ্ছে, ছুটন্ত ট্রেনে আগুন লেগে যাচ্ছে, গেট খোলা রেখেই ট্রেন চলতে শুরু করছে ইত্যাদি ব্যাপার চলছে তো চলছেই। পরিণতিতে গত জুলাই মাসে সজল কাঞ্জিলালের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, যা পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকার ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এছাড়া, মেট্রোতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থাও যথাযথ নয়। বেশ কিছু প্ল্যাটফর্মে এসকালেটর নেই, ফলে বৃদ্ধ বা অসুস্থ সকলকেই ৩০-৩৫ ফুট সিঁড়ি ভেঙে নামতে-উঠতে হয়। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও এই সমস্ত দিকে মেট্রো কর্তৃপক্ষ কোনও নজরই দেয়নি।

সুষ্ঠু পরিষেবার জন্য প্রথমত দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেন। অথচ দিনে গড়ে ২০-২২ টি রেক পাওয়া যায়। ফলে অফিস টাইমে লাগাতার ট্রেন বাতিল এবং সময় মতো ট্রেন না চলা একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত দরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মী। কলকাতা মেট্রোতে ১৯২ জন ড্রাইভারের মধ্যে ১০০ জনই পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল থেকে ধার করা। প্রতিটি বিভাগেই বহু পদ খালি পড়ে রয়েছে। কর্মীদের অধিকাংশই অস্থায়ী অথবা ঠিকা। এভাবে উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব?

সরকারি পরিবহণ কোনও ব্যবসা নয়, জনগণের জন্য রাষ্ট্রের ন্যূনতম দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি সরকার চরম গাফিলতি করছে। এই অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে এসইউসিআই(সি) প্রতিটি স্টেশনে যাত্রী কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। আন্দোলন ছাড়া সাধারণ জনতার কাছে বাঁচার কোনও রাস্তা নেই। জোট বেঁধে লড়েই সরকারের অমানবিক, অন্যায় সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com